Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501064 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Karna Charitra: In the context of Ramdurllabh Kavyavisharad's 'Karna-Digvijay'

কর্ণ চরিত্র: প্রসঙ্গাত রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদের 'কর্ণ-দিগ্বিজয়'

Beauty Rudra
Researcher
Bengali Department
Burdwan University

Received on: 01st May 2026
Accepted on: 13th May 2026

Abstract:
In the first half of the twentieth century, among the dramatists who portrayed the character of Karna from the Mahabharata, one of the notable figures was Ramdullabh Kavyavisharad. In his play "Karna-Digvijay," the way in which Karna, the great donor of the Mahabharata, is depicted is the subject of discussion here.

Key Words:
Ramdurlav Kabbabisharad's 'Karna Digbijoy'

মূল প্রবন্ধ

বিশ শতকের প্রথমার্ধে 'মহাভারত'এর কাহিনিকে কেন্দ্র করে যে সকল নাট্যকার বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্ন সংযুক্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাঁকুড়া জেলার বেলতায়। খুব ছোটো বয়স থেকে তিনি আকৃষ্ট হন পালা রচনার দ্বারা। তাঁর রচিত পালায় দেখা যায় ধারাবাহিকতা ও সমসাময়িকতার নানা লক্ষণ। হাস্যরসের উপস্থিতি তাঁর পালার ছত্রে ছত্রে চোখে পড়ে। তাঁর রচনার ভাষা ছিল সরস। সংগীতের আধিক্য ওই পালাগুলিকে এক অনবদ্য সৌন্দর্য দান করেছিল, সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে জুড়ির গান, গণের গান ইত্যাদি।

সময়টা ১৩৩০-১৩৩৮ বঙ্গাব্দ। তাঁর যে সকল সাহিত্যকর্মের খোঁজ আমরা পেয়েছি, তার বেশিরভাগটাই এই সময়ে রচিত। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পেয়েছিল 'পুষ্কল মোচন' এবং 'পাঞ্চালী'। প্রথমটি রামায়ণের কাহিনিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই নাটকের অভিনবত্ব সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছেন, "আমার রচনার কিছু বৈচিত্র্য না থাকিলেও এই নাটকে পুরাণের অতি অলৌকিক ব্যাপারই বর্ণিত আছে। যাহার সম্পূর্ণ নূতনত্বে গঠিত, যে চিত্র নাট্য-সমাজের অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই বা কেহ কখন নাট্যকারে শ্রবণ করেন নাই, সেই অভিনব দৃশ্য নাটক।"[১] অভিনয়ের অভিনবত্ব ও কাহিনির নতুনত্বের কারণেই নাটকটি আজও সভ্যজনের আসরে আলোচিত হয়।

এই একই সময়ে রচিত অপর একটি নাটক হলো 'পাঞ্চালী'। 'মহাভারত'এর ঘটনাকে আশ্রয় করে তিনি এই নাটকের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। এখানে রয়েছে জতুগৃহ দাহের কথা, হিড়িম্ব, বকাসুর বধ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি। তিনি এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর মাকে। এই উৎসর্গ পত্র থেকে আমরা জানতে পারি তিনি তাঁর পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। ব্যক্তি

© Santiniketan Sahityapath

জীবনের এই সকল ছোটো ছোটো তথ্য আমরা তাঁর সৃষ্টি সম্ভার থেকেই খুঁজে নেবার নিরন্তর প্রচেষ্টা করব। তৎকালীন সময়ে প্রকাশকদের উপর তাঁর ক্ষোভ বা ক্রোধের কথাও আমরা 'পাঞ্চালী'র ভূমিকা থেকে জানতে পারি। তাঁর রচনা পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিল খুব সাবলীলভাবেই। ফলত বাজারে তাঁর গ্রন্থের চল ছিল বেশি। তাই প্রকাশকরা গ্রন্থের যথাযোগ্যতা বজায় না রেখেই তা প্রকাশ করতেন। তার জন্য গ্রন্থের গুণগত মানের হ্রাস ঘটেছিল, "প্রকাশকগণ আমার রচনার উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করেন, তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি আমার হস্তের বহির্ভূত; যে যাহা পারে সে তেমনি করিয়াই ছাপাইয়া থাকে; কেহ বা রং ফলাইয়া লয়, কেহ বা ঢং বদ্‌লাইয়া দেয়, ইচ্ছামত পরিবর্দ্ধন পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে; সেজন্য আমি দুঃখিত হইতাম না, যদি আমার অপেক্ষা কোন সুযোগ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা সে কার্য্য সমাধা হইত, তাহা ত হয় না — যাহা হয় — তাহা নিকৃষ্ট বাচালতা মাত্র।"[২] নিজের লেখার এহেন অবমাননা কোনো স্রষ্টায় মেনে নিতে পারেন না। তিনিও পারেন নি। তাই লেখনীকে প্রতিবাদের মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। আর লেখনী শুধু প্রতিবাদের অস্ত্রই হয়ে ওঠেনি, হয়ে উঠেছিল মানুষের মনের খোরাক মেটানোর সবথেকে বড়ো অবলম্বন। 'পাঞ্চালী' নাটকটির সফলতা যা প্রমাণ করে। এখানে আছেন 'মহাভারত'এর চির-পরিচিত চরিত্ররা। আছেন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সূর্য, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, বিদুর, যুযুৎসু, দ্রুপদ, শ্রীখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বেদব্যাস, কুন্তী, দ্রৌপদী, কল্যাণী, মধুমতী, হিড়িম্বা, নিষাদী প্রমুখ। পাঁচটি অঙ্ক ও উনিশটি দৃশ্যের সমাহারে সুসজ্জিত এই নাটকে আমরা 'মহাভারত'এর কাহিনিকে পুনরায় নতুন ভঙ্গিতে দেখতে পাই।

রামায়ণের কাহিনিকে অবলম্বন করে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে তিনি রচনা করেছিলেন আরো একটি নাটক। এটি হলো 'সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ'। মহর্ষি বাল্মীকি রচিত 'অদ্ভুত রামায়ণ'এ আছে সহস্রস্কন্ধ রাবণের কথা। পুষ্কর দ্বীপের অধিপতি, রাবণের সহোদর, মাতা নিকষার সন্তান এই সহস্রস্কন্ধ রাবণ। 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নাট্যকার বলেছেন, "কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত 'মহাভারত'এর মধ্যেই যেমন গীতাপর্ব্ব, অথচ যেমন পৃথগ্‌ভাবে সন্নিবেশিত আছে। অদ্ভুত রামায়ণও সেইরূপ রামায়ণ হইতে পৃথগ্‌ভাবে বিন্যস্ত; মহর্ষি বাল্মীকি উভয়েরই রচয়িতা। লঙ্কার দশস্কন্ধ, অহোলঙ্কায় শতস্কন্ধ — পুষ্করে সহস্রস্কন্ধ রাবণ, ইহাদের প্রত্যেকেরই বীরত্ব অসাধারণ।"[৩] এই নাটকে আছেন 'রামায়ণ'এ অতি চেনা সেই চরিত্ররা। 'রামায়ণ'এর পরিপূর্ণ আবেশ ও পরিবেশ যেন এক মলাটে উপস্থিত হয়েছে এই নাটকে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে রচিত হয়েছিল 'মহামায়া বা ঘোরাসুর-বধ গীতাভিনয়'টি। তাঁর রচিত অপর একটি নাটক 'কর্ণ- দিগ্বিজয়'এর সূচনায় রয়েছে 'মহামায়া বা ঘরাসুর-বধ গীতাভিনয়'টির উল্লেখ। সেখানে তিনি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এই নাটকের বিষয়বস্তু — "ইহাতে সেই বজ্রদন্ত, প্রসেন, পিণ্ডীসুর, কালভৈরব, শাক্তানন্দ, ঘোরাসুর, নারদ, শুক্রাচার্য্য ও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মহামায়া, শিবদূতী, শচী, অদিতি, চন্দ্রলেখা এবং উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গ বিদ্যাধরীগণ আর সেই দেববালাগণের অপূর্ব্ব সঙ্গীত কুহকিনী মায়াবিনীর মায়াজাল বিস্তার।"[৪] এই গীতাভিনয়টি যে দর্শকের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছিল, সে বিষয়ও তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। এটি পাঁচটি অঙ্ক ও কুড়িটি দৃশ্যে সজ্জিত হয়েছে। রয়েছে একটি ক্রোড় অঙ্ক। গ্রন্থের মাঝে মাঝেই রয়েছে ঘোড়াসুর কর্তৃক বাঁ হাতে শচীর কেশপাশ ধারণের চিত্র, ঘোরাসুরের সঙ্গে মহামায়া যুদ্ধের চিত্র ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে এই ধরনের বিষয়-উপযোগী চিত্রের অবতারণা পাঠকদের চিত্তকে আকর্ষণ করেছে খুব স্বাভাবিকভাবেই।

পাঠকের রুচিকে স্বীকৃতি জানিয়ে তিনি রচনা করেছিলেন 'ভার্গব-বিজয়' ও 'ভীষ্ম-বিজয়' নাটকদুটি। 'ভার্গব-বিজয়' এ আছে পরশুরামের ক্ষত্রিয় বিনাশের কাহিনি, আছে গণেশের দন্তভঙ্গের কথা। নাটকটি দর্শকমহলে বিপুল পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল — "ইহার অভিনয়ে বঙ্গদেশে একটা খুবই সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল — প্রশংসা লোকের মুখে মুখে সর্বত্র বিচিত্র ঘটনা — বিরাট রচনা, নবভাবের নবরসের অবতারণা।"[৫] শুধু অভিনয়ের মঞ্চে নয়, গ্রন্থ হিসাবেও অনেকেরই চাহিদার তালিকায় ছিল এই নাটকটি। লেখক নিজেই সে কথা আমাদের জানিয়েছেন — "অনেকেই ইহা পুস্তকাকারে পাইবার জন্য বহু দিবস যাবৎ অতীব আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন, এইবার সকলে গ্রহণ করুন। প্রত্যহ বহু সংখ্যক বিক্রয় হইতেছে, শীঘ্রই ফুরাইবার সম্ভাবনা।"[৬] 'মহাভারত'এর কাহিনিকে

© Santiniketan Sahityapath

নিয়ে রচিত এই নাটকটি দর্শক তথা পাঠক মনে নিজস্ব জায়গা করে নিয়েছিল এর নাট্যগুণের কারণেই। প্রশংসা পেয়েছিল যামিনী ভাণ্ডারী ও ষষ্ঠী অপেরার অভিনীত 'ভীষ্ম-বিজয়' নাটকটি। এখানে রয়েছে পরশুরামের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধের কথা। গুরু ও শিষ্যের যুদ্ধ, নারীর প্রতিহিংসা এই নাটকের বিষয় হয়ে উঠেছে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে রচিত তাঁর অন্যতম নাটক হলো 'ভুবনেশ্বরী'। এই নাটকটিতেও দেখা যায় চিত্রের উপস্থাপনা। তাঁর রচিত অপর একটি নাটক হলো 'সত্যভামা'। এটি রচিত হয়েছিল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে। শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামার পরীক্ষার কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছিল এই পালাটি। আমরা রামদুর্লভ কাব্যবিশারদের নাট্যসম্ভার লক্ষ করলে দেখতে পাই রামায়ণ ও 'মহাভারত'এর কাহিনির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। পৌরাণিক নাটক রচনায় তাঁর অভিনবত্ব তাঁকে অন্যান্যদের থেকে আলাদা করেছে। বই-বাজারের ছিল তাঁর নাটকের বিপুল চাহিদা। কেন তাঁর নাটকের এত চাহিদা ছিল বাজারে? এ প্রসঙ্গে অধরচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন, "কেন না, নানাবিধ রসের সামঞ্জস্য রাখিয়া করুণ রস-নাটক রচনায় ইনি সিদ্ধ-হস্ত। নাটক ভক্তিভাবপূর্ণ ও করুণ রসাশ্রিত হইলে তাহা যেমন সহজে হৃদয় অধিকার করে, তেমনিই সহজে ভুলিতে পারা যায় না; সেই জন্য কাব্যবিশারদ মহাশয়ের নিত্য-নতুন নাটকগুলির যশোরশ্মিতে চারিদিক উদ্ভাসিত।"[৭] তাঁর নাটকে করুণ রসের নিপুণতায় ভক্তিবাদের সুর দর্শক-চিত্তকে করত আবেগ রঞ্জিত। তাঁর অন্যান্য নাটক অপেক্ষা 'অতীব মনোজ্ঞ ও উপাদেয়'[৮] নাটক হলো 'কর্ণ-দিগ্বিজয়'। এই নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করে এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব রামদুর্লভ কাব্যবিশারদের দৃষ্টিতে 'মহাভারত'এর কর্ণকে। এই চরিত্রের দোষ, গুণ তুলে ধরে আমরা ভাবতে চেষ্টা করব 'মহাভারত'এর কর্ণকে আর একবার নতুন ভাবে।

'কর্ণ-দিগ্বিজয়' নাটকটি প্রকাশিত হয়েছিল তারা লাইব্রেরি থেকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে। প্রকাশক অধরচন্দ্র চক্রবর্তী। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রার দলের দ্বারা এটি অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি উৎসর্গ করা হয়েছে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবকে। এই নাটকটিতে 'মহাভারত'এর অন্যতম বীর যোদ্ধা কর্ণের বিশ্ব-বিজয়ের কাহিনিকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটির সূচনা হয়েছে পাণ্ডবদের বনবাসের পর। কৌরব পক্ষের ভরসার কেন্দ্রবিন্দুতে কর্ণ প্রথম থেকেই অধিষ্ঠিত। নাটকের শুরু থেকেই সেই আস্থা জ্ঞাপনের কথা শোনা যায় শকুনির মুখে — "একাই হাসিল করব, ভীষ্মই বলুন, দ্রোণই বলুন, কারো তোয়াক্কা রাখে না সুবলে রাজা, কেবল বাবাজী কর্ণ আমাদের সহায় থাকলেই হ'চ্ছে — কোন বেটার বেটাকে চাই না।"[৯] বনবাসী পাণ্ডবদের দুর্যোধনের ঐশ্বর্য এবং শৌর্য্য প্রদর্শনের জন্য নাচ, গান, তামাশা, খেলার আয়োজন করেছেন কৌরব পক্ষরা। এই ষড়যন্ত্রকে লুকিয়ে রেখেছেন মহান উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায়ের মোড়কে। এই কার্যের প্রধান ব্যবস্থাপক কর্ণ। এর জন্য দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তিনি। প্রথমত মৃগয়া ও দ্বিতীয়ত ঘোষপল্লীর গো-বৎস সংখ্যা। দ্বিতীয় ব্যবস্থার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, "এই অছিলায় পাণ্ডবগণকে রাজা দুর্য্যোধনের রাজশ্রী পরিদর্শন করান।"[১০] এমতাবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র বাধার সম্মুখীন হবার আশঙ্কা করেছেন। তখন কর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "কর্ণের বাহুযুগলের যতক্ষণ শরাশন থাক্‌বে, অথবা হৃদয়ে এক বিন্দু শোনিত যতক্ষণ থাক্‌বে ততক্ষণ কারো বাধা বা ভয় কৌরবের নাই বা থাকা অসম্ভব। কর্ণ বিদ্যমান কৌরব অজেয় ও নিঃশনঙ্ক নির্ভয় সহায়কাম্।"[১১] ধৃতরাষ্ট্রও ভরসা করেছেন কর্ণের প্রতি। বিদুর এসে তাঁদের এত সাজ-সজ্জা ও উৎসবের কারণ জানতে চাইলে কর্ণ প্রায় ভৎসনার সুরে বিদুরকে বলেছেন, "... উনি পঞ্চপাণ্ডব হিতৈষী এবং কৌরব বিদ্বেষী —।"[১২] বিদুর অপমানিত হয়ে চলে যান। বয়োজ্যেষ্ঠ বিদুরের প্রতি কর্ণের এহেন ব্যবহার তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই বিরোধিতা করে। এরপর ভীষ্ম বিদুরের মতো একই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উভয় দুই কারণ পিতামহকে ব্যক্ত করেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্কার জানান। তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে কর্ণ বলেন, "রাজার স্বাধীন প্রবৃত্তি দমিত করা রাজ্যবাসীর অনুচিত, রাজা রাজদণ্ড পরিচালনায় স্বাধীন প্রবৃত্তি নিয়ে বিচরণ করবে, তা'তে বাধা দিবার কিছুই নাই। পরমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করা অপেক্ষা রাজার রাজত্ব পরিত্যাগ করাই শতাংশে শ্রেয়স্কর।"[১৩] একথা ঠিক যে রাজা যদি নিজের ইচ্ছায় রাজ্য পরিচালনা করতে না পারেন, তাহলে তাঁর পদত্যাগই শ্রেয়। কিন্তু এই কার্য সমাধার প্রকৃত সত্য জানতেন কর্ণ। একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটা ঘৃণ্য কাজকে সমর্থন জানিয়ে প্রকৃত সত্য গোপন করার প্রয়াস কর্ণ চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে। ভীষ্ম এ কার্যের জন্য কর্ণকে তুলনা

© Santiniketan Sahityapath

করেছেন, "তস্কর যেমন সাধুতার অন্তরালে অবস্থিত, তুমিও তেম্‌নি ভদ্রতার বহির্ভূত।"[১৪] কিন্তু কর্ণ এখানে কেবল কৌরব তথা দুর্যোধনের কাছেই কৃতজ্ঞ। তাই ভীষ্মকে বলা বাক্যে তাঁর অহংকারই প্রকাশ পেয়েছে — "এতটা অপমান অভাগা পাণ্ডবগণই আপনার সহ্য কর্‌বে, বীর যারা তারা কখনই সহ্য করতে পার্‌বে না। এর সমুচিত উত্তর দিতে কর্ণ জানে, কিন্তু কৌরব পিতামহ বলেই সে আপনার নিকট মস্তক অবনত ক'রে আছে ...।"[১৫] আত্মবিশ্বাসী কর্ণ, এ কথা যেমন সত্য তেমনি এখানে কর্ণের আপন শক্তিতে যে অহংকার প্রকাশ পেয়েছে সে কথাও সমানভাবে সত্য। অভিসন্ধি বুঝতে পেরে ভীষ্ম তাঁদের প্রতিহত করবার চেষ্টা করেন। এমনকি দুর্যোধনকে সেই কাজ থেকে বিরত থাকবার প্রস্তাব দেন তিনি। দুর্যোধনকে অপমানসূচক কথা বললে বন্ধুবৎসল কর্ণ সে অপমান সহ্য করতে পারেন নি। ভীষ্মের প্রতি তাই তিক্ত মন্তব্য করেছেন। কর্ণের পূর্ণ সম্মতিতে, ভীষ্মের সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে ঘোষ-যাত্রার। রওনা দিয়েছেন কৌরব-সহ কর্ণ। এখানে দুর্যোধন ও স্ত্রী ভানুমতির মান-অভিমানের কথোপকথনের মাঝে প্রবেশ করেন কর্ণ। তাঁদের ঝগড়ার মীমাংসা করেন তিনি। দুর্যোধন তাঁকে দেখে খুব আনন্দিত হন। ভানুমতির কথা প্রসঙ্গে এসেছে কর্ণের স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা। তাঁর শুভ বচনে উভয়ের কলহের মীমাংসা ঘটেছে। শকুনির সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপের পরামর্শ করবার জন্য প্রস্থান করেছেন কর্ণ দুর্যোধন-সহ। এরপর গন্ধর্বদের বিহার বনে ভানুসেন প্রবেশ করে দেখেছেন বালকেরা সেই স্থানকে কলুষিত করেছে। তার প্রতিবাদ করলে দুর্যোধন ও শকুনি ভানুসেনের উপর বল প্রয়োগ করেন। এখানেও এই অন্যায় কাজের সমর্থন জানান কর্ণ। উভয় পক্ষের লড়াইয়ে পরাজিত হন ভানুসেন। কর্ণ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান এই ঘটনার প্রতিকারের জন্য। চিত্রসেনের উপস্থিতির কথা স্মরণ করেন দুর্যোধন। বন্ধুকে সাহস দিয়ে কর্ণ বলেন, "আসুক — আগমন তার প্রার্থনাই কর্‌ছি — এক্ষণে যাও সকলে — নির্ভয়ে স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত হও।"[১৬] এ পর্যন্ত কর্ণ তাঁর অর্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি ও সামর্থ্য সবই ব্যবহার করেছেন দুর্যোধনকে সমর্থন করবার জন্য। যেখানে দুর্যোধনের প্রায় সকল কাজই অন্যায়ের শামিল। এদিকে যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করেছেন কৌরব পক্ষকে। তখন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন কর্ণ। উৎসাহ দেন, সাহস যোগান সেনাদের। শুরু হয় গন্ধর্ব ও কৌরব পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। কর্ণকে সূত জাতি হয়ে ধনুর্বিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ ও তাঁর প্রয়োগের জন্য ভর্ৎসনা করেন চিত্রসেন। সেই অপমানের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "আজ তুমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদর্শন ক'রে অর্জ্জুন পিতা দেবেন্দ্র বাসক কে বিজ্ঞাপিত করবে কর্ণের অমিত বাহুবল।"[১৭] চিত্রসেন কর্ণের কাছে দুর্যোধনের পাপকর্ম তুলে ধরে ত্যাগ করতে বললেন তাঁর সঙ্গ। কিন্তু আনুগত্যের কারণেই এই অভিযোগ শুনতে চান নি কর্ণ।

পুনর্বার আরম্ভ হয় যুদ্ধ। দুর্যোধন পক্ষের সঙ্গে চিত্রসেনের যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করতে চান কর্ণ। এ কোন কর্ণ? যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময় শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন ধনুক হাতে, সামান্য মুহূর্তের জন্য এমন ভাবনা তাঁর যোদ্ধা-সত্তাকে করেছে কলঙ্কিত। প্রকৃত যোদ্ধা কখনো রণস্থল থেকে পলায়ন করেন না। কিন্তু পরক্ষণে আবার ভীষ্ম, দ্রোনের কাছে গঞ্জনা পেতে হবে এই ভেবে ফিরে এসেছেন তিনি। গুরু অভিশাপের কথা উদিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিতে। এখানে স্বীকার করেছেন যে মিথ্যা পরিচয়ে গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তিনি —

"প্রতারণা করি, ব্রাহ্মণ বলি শিখেছিনু
অস্ত্র রামের কাছেতে —"[১৮]

গুরুর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন তিনি। প্রকৃত শিষ্যের তকমা থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছেন তিনি। এদিকে যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন চিত্রসেন। পলায়ন করেছেন কর্ণ। এমনকি কৌরব-কুলের বধূদের গন্ধর্বরা হরণ করলে, তাঁদের রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। তাঁর বীরত্ব যেন অনেকাংশে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এখানে।

কৌরবপক্ষকে উদ্ধার করেছেন পঞ্চ পাণ্ডব। আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের আশ্রমে। সেখানে কথা প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির বিকর্ণের কাছে জানতে চেয়েছেন এই যুদ্ধে কর্ণের পরিণতি সম্পর্কে। বিকর্ণ কর্ণের কোনো খোঁজ দিতে পারেন নি। তখন যুদ্ধের ভয়াবহতা বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছেন যুধিষ্ঠির। কারণ কর্ণ বীর। তাঁর পরিণতি যুদ্ধের ভয়াবহতাকেই চিহ্নিত করেছে। যুধিষ্ঠির বলেছেন, "অকাণ্ডে প্রলয়বৎ

© Santiniketan Sahityapath

অতিভয়ানক যুদ্ধ হ'য়েছে তা'হ'লে, বিকর্ণ — কর্ণ যে সহজাত কবচকুণ্ডলধারী — তার যে সহসা মৃত্যু হবে না ভাই।"[১৯] যুধিষ্ঠিরের এই মন্তব্য প্রমাণ করেছে কর্ণের শৌর্যকেই।

যোদ্ধা কর্ণ, বন্ধু কর্ণ — তাঁর এই পরিচয় আমরা পেয়েছি। এখন দেখব পারিবারিক জীবনে কেমন ছিলেন কর্ণ? তাঁর জীবনসঙ্গী পদ্মাবতী। স্বামীর কৌরব পক্ষের সঙ্গো সংযোগ মেনে নিতে পারেন নি তিনি। তাছাড়া কর্ণ যে কীভাবে শুধু দুর্যোধনের প্রতি আনুগত্যের কারণে নিজের স্ত্রী, পুত্রকেও ভুলে গিয়েছিলেন, তা এই নাটকে পদ্মাবতীর উক্তিতে স্পষ্ট —

"... কৌরবের পুরে
সদা স্থিতি, ভালোবাসা বলি
পত্নী পুত্র কিছু নাহি মনে তাঁর
রাজা দুর্য্যোধন কণ্ঠহার
সদা তাঁর "[২০]

স্ত্রীর মনেও প্রশ্ন জেগেছে যিনি বীর যোদ্ধা, যিনি দাতা, যিনি ধার্মিক, কেন তিনি অবলম্বন করেছেন অধার্মিক দুর্যোধনের পক্ষ? পরিবারজনের থেকে কর্ণ কর্তব্যকে বড়ো করে দেখেছিলেন। উপেক্ষা করেছিলেন সুখের সংসার জীবনকে। সাংসারিক জীবন থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে কেবল নিজের প্রতিজ্ঞাই পালন করে গেছেন কর্ণ। তা চেতনে হোক বা অবচেতনে, কর্তব্যই তাঁর কাছে শেষ কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই গন্ধর্বগণের সঙ্গো যুদ্ধে পরাজিত অচেতন কর্ণ যখন চেতনা ফিরে পেয়েছেন, তখন সর্বপ্রথমে তিনি দুর্যোধনের জন্যই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। পথের মধ্যে ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে দেখতে পেয়ে তাঁদেরকে দুর্যোধনের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। তাঁদের কাছে পূর্বের সকল বৃত্তান্ত জানতে পেরেছেন তিনি। সেই মুহূর্তে যুধিষ্ঠির তাঁকে অনুরোধ করেছেন তাঁর আশ্রমে আতিথেয়তা গ্রহণের জন্য। কর্ণের মনে প্রবাহিত হয়েছে ভ্রাতৃস্নেহের ঢেউ। ভাইয়ের এরকম শুভ্র, পবিত্র চরিত্র প্রত্যক্ষ করে তাঁর মনে হয়েছে, "আমার ভাই না হ'লে, কুন্তী মাতার পুত্র না হ'লে এতটা মনুষ্যত্ব কার থাকতে পারে ?"[২১] পুণ্যাত্মা ভাই তাঁর। গর্বিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনি। কিন্তু আজীবন আজীবনপ্রাপ্ত অভিশাপ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা আর দুর্যোধনের প্রতি আনুগত্য তাঁকে তাঁর মনে ভ্রাতৃস্নেহের নিরন্তর প্রবাহকে বাধা দিয়েছে। তাই পরম আপনজন ভাই পরিণত হয়েছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শত্রুতে। পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গো শত্রুতা সম্পাদন করাই তাঁর জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, "আমি শত্রু, শত্রুতা সাধনই পাণ্ডবের সঙ্গো আমার জীবন ব্রত।"[২২] কিন্তু আবার যখন মনের মধ্যে ভাইয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন, তখনি তিনি তাঁদের আলিঙ্গান করে শান্ত হতে চেয়েছেন। আর তা যখন পারেন নি তখন অন্তর জ্বালায় দগ্ধ হয়েছেন তিনি —

"যুধিষ্ঠির! কিন্তু যুধিষ্ঠির!
বড় মনে রহিল কর্ণের খেদ,
তোমা হেন গুণীন্দ্র মুকুটমণি
থাকিতে এ ভ্রাতা, ভ্রাতা বলি
সম্বোধন নারিনু করিতে"[২৩]

তাইতো নিজেকেই মনে করেছেন 'হিংসাবৃত্তি কলুষিত অশুদ্ধ মানব'।[২৪] তাই যুধিষ্ঠিরের পূর্ণাশ্রমে যেতে চাননি তিনি। কিন্তু তাঁদের আতিথেয়তা লাভ করার লোভও সম্বরণ করতে পারেন নি তিনি। তাই অদূরে বৃক্ষ তলদেশে পড়ে থাকা দুটি আম তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেছেন তিনি। ভাইয়ের দেওয়া সামান্য বস্তু তাঁর কাছে মহার্ঘ্য হয়ে উঠেছে। তবুও বশ্যতা, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার তাঁকে সেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কাহিনি বর্ণনার অভিনবত্ব এই নাটককে এক স্বতন্ত্র আঙ্গিক দান করেছে।

ঘটনার পট পরিবর্তনে কর্ণের সঙ্গো দুর্যোধনের সাক্ষাৎ ঘটেছে। তিনি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন কীভাবে তিনি উত্তীর্ণ

 © Santiniketan Sahityapath

হয়েছেন সেই ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে। দুর্যোধন তখন পাণ্ড-পুত্রদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নাট্যকার এমনভাবে নাটকের সংলাপ সাজিয়েছেন যে পাঠককে প্রথমে ভাবতে বাধ্য করেছেন যে যুধিষ্ঠিরের আতিথেয়তা, উদারতা দুর্যোধনকে বদলে দিয়েছে। তিনি সত্যিই ধর্মের পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু নাটকের কিছুটা অগ্রগতি ঘটলেই দেখা যায় দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের ভালোবাসায় বদলে যান নি। বরং পঞ্চ পাণ্ডবের সাহায্যে তাঁর যে জীবনরক্ষা পেয়েছে, সে জীবন তিনি রাখতে চান নি। যে সখার অর্থাৎ কর্ণের বাহুবল তাঁকে রক্ষা করতে পারেন নি, তিনি ধিক্কার জানিয়েছেন সেই বীরত্বকে। কর্ণের ব্যর্থতার তালিকা তাঁর সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। অপমান, লাঞ্ছনার জ্বালায় তিনি কর্ণের উপর উদ্‌গিরণ করেছেন তিক্ত বাক্য — "বৃথা দাম্ভিক তুমি কর্ণ!"[২৫] যে বন্ধুর জন্য, সর্বোপরি যে বন্ধুত্বের জন্য তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সমর্পণ করেছেন, যাঁর জন্য তিনি পরিবার-পরিজন থেকে দূরে সরে থেকেছেন, সেই বন্ধু যখন তাঁর বীরত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তখন কর্ণ আত্মগ্লানির দহনে নিজেকে দগ্ধ করেছেন। আর দুর্যোধন যখন আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন, তখন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর জীবনে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। তিনিও আত্মহননের পথই অবলম্বন করতে চেয়েছেন। বন্ধুর জন্য জীবন পণ করেছেন; তাঁরা একসাথে বাঁচবেন, না হয় মরবেন। শুধু তাই নয়, তিনি জানেন দুর্যোধন অধার্মিক। তবুও তিনি তাঁর পক্ষ ত্যাগ করেন নি। শুধুমাত্র অঙ্গারাজ্য প্রদানের জন্য এতটা বশ্যতা স্বীকার কী কর্ণের মতো বীরযোদ্ধা করতে পারতেন, যদি না তাতে প্রকৃত বন্ধুত্ব থাকত, যদি না থাকত ভালোবাসার নিবিড় আকর্ষণ। কর্তব্যের জন্য তিনি দুর্যোধনকে সমর্থন করেছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু তিনি কৌরবদের যে প্রকৃত বন্ধু ছিলেন সে কথাও ততোধিক সত্য। বন্ধুত্বের প্রতীক হয়ে থেকে যাবেন কর্ণ কাল থেকে কালান্তরে।

এরপর দেখা যায় বন্ধু দুর্যোধনকে রাক্ষসরা হরণ করে নিয়ে গেছেন তাঁর সম্মুখেই। একথা জানতে পেরে ভীষ্ম, দ্রোণ সকলই কর্ণকে নানা কটুক্তি করেন। তিনি চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে, তাই কলঙ্কিত হয়েছে তাঁর যোদ্ধা-সত্তা। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৌরবদের দুর্ভাগ্যের কারণ হিসাবে তাঁকেই চিহ্নিত করেছেন তাঁরা। বলেছেন, "আমরা যেমন নিরপেক্ষভাবে কাল কাটালুম ঐ দুরাত্মা কর্ণও যদি ওরূপভাবে কাল কাটাত তা'হ'লে কৌরব সৌভাগ্যলক্ষ্মী আরো অতিক্রম করত, কিন্তু তা' হ'তে দিলে না ঐ কর্ণ ..."[২৬] শুধুমাত্র দুর্যোধনের ক্ষতির কারণ হিসেবে গুরুদেব কর্ণকে দোষী করেছেন তাই নয়, পরশুরামের সম্মান রক্ষা করতে পারেন নি বলেও অপমান করেছেন। সম্বোধন করেছেন 'সর্ব্ব সর্বনাশকর্ত্তা' বলে। তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন — "... তুমি ক্ষাত্রবৃত্তি সূত্রধর নয়? মা তোমার রাধা সূত্রধরী পালয়িত্রী, তুমি অন্যায় ত্যক্ত পুত্র, এই জন্যই তোমার লঘু গুরু জ্ঞান নাই।"[২৭] এহেন অপমান, লাঞ্ছনা শুধু গুরু দ্রোণই নন, ভীষ্মও অবিরাম গঞ্জনা করেছেন। যদিও পিতামহ জানতেন তাঁর প্রকৃত জন্ম-পরিচয়। তবুও তাঁকে অসম্মানে, অপমানে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিলেন পিতামহ। যিনি দুর্যোধনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী ছিলেন, তাঁকে সুবিধাভোগী পর্যন্ত বলেছেন ভীষ্ম। শুধু সুখের সময় কর্ণের উপস্থিতি — পিতামহের এহেন মন্তব্যে কর্ণ বিধ্বস্ত। তাঁকে একাধিকবার সূতপুত্র বলে সম্বোধন করেছেন দ্রোণ ও ভীষ্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্যোধনকে উদ্ধার করতে যেতে চেয়েছেন কর্ণ। অপমানের তীব্র বিষ-জ্বালা সহ্য করেও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দুর্যোধনের দিকে। আমরা বারবার দেখতে পাই বন্ধু কর্ণের স্বরূপটিকে। কখনো অপমানিত হয়েও ত্যাগ করেন নি বন্ধুত্ব, আবার কখনো প্রলোভনের সম্মুখে সহাস্য মুখে পক্ষ নিয়েছেন বন্ধুর। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সামনে দুর্যোধনের স্বরূপ তুলে ধরলেও তা বিশ্বাস করতে চাননি তিনি। জানিয়েছেন —

"দুষ্ট হোক্, — শিষ্ট হোক্ — প্রিয় হোক্
অপ্রিয় হোক্ — পাপী হোক্ — পুণ্যবান হোক্ — দুর্য্যোধন
আমার প্রাণের মিত্র — পাণ্ডব আমার চিরশত্রু।"[২৮]

পাণ্ডবদের নিজের ভাই বলে জেনেও বন্ধুত্বের অঙ্গীকারেই ভাই অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু হয়ে উঠতে ছিলেন তিনি সদা তৎপর। নিজে থেকেই ফিরে আসেন দুর্যোধন। পিতামহ ও গুরুদ্রোণ তাঁকে যে অপমানসূচক মন্তব্য করেছিলেন, তা তাঁর পুত্র বৃষকেতু লক্ষ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে কেন অপমান করা হচ্ছে তার কারণ জানতে চেয়েছেন ভীষ্মের কাছে। যে পিতামহ কর্ণকে লাঞ্ছনায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পিতামহের প্রতি কর্ণ আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। তাঁর স্নেহ পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন — "যত চেষ্টা করি

© Santiniketan Sahityapath

তোমার স্নেহকণা স্পর্শ করতে — ততই তুমি তোমার নেহাঙ্ক হ'তে কর্ণকে অতিদূরে সরিয়ে দাও যে! আমি জানি তুমি আমার কে, কিন্তু তুমিও কি জান বৃদ্ধ আমি তোমার কে — হা কুন্তি মা! লুকান আনন্দের সম্পর্ক মাত্র বুঝালি, প্রকাশ হ'তে দিলি না মা !"[২৯] নিজের ভাগ্য, নিজের মায়ের উপর অভিমান করেছেন তিনি। নিজের আত্মার সম্পর্কগুলোকে আলিঙ্গান করার অভিপ্রায় কর্ণের রয়েই গেছে আজীবন। কিন্তু কোথাও তিনি অস্বীকার করেননি তাঁর কর্তব্যকে। ভুলে যাননি দুর্যোধনের উপকারকে। তাই পুত্র বৃষকেতু যখন 'আপনার মিত্র দুর্য্যোধনকে সর্ব্বদেশের সার্বভৌম সম্রাট্'[৩০] করবার জন্য পিতাকে প্রতীক্ষা করতে বলেছেন, তখন তিনি শপথ নিয়েছেন দুর্যোধনকে 'ভারতের একছত্র সম্রাট্ করব।'[৩১] আর তা যতদিন না সম্পন্ন করতে পারবেন ততদিন নিজের জীবনধারণেও কঠিন ব্রত পালন করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি। এরপর শুরু হয়েছে তাঁর বিশ্ব জয়ের জন্য পথচলা। তিনি সদর্পে জানিয়েছেন তাঁর অভিপ্রায় — "এই আমি দিগ্বিজয় যাত্রায় বহির্গত হলেম, হে পিতঃ অন্ধরাজ! এ মিত্র দুর্য্যোধন! হে মাতুল শকুনি! হে ভ্রাতঃ দুঃশাসন ও বিকর্ণ! সকলে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ মনে কালক্ষয় করুন — ইঙ্গিতে সমস্ত ধরণী জয় ক'রে তোমাকে প্রদান কর্‌তে এই বহির্গত হলেন।"[৩২] এ কর্ণ আত্মশক্তিতে বলবান। তাইতো ভীষ্মদেবের কাছে নিজেকে 'পরিপূর্ণ মনোরথ পূর্ণরথ'[৩৩] বলে ঘোষণা করেছেন। কর্ণের পৃথিবী বিজয়যাত্রা তাঁর কর্তব্য, নিষ্ঠা, কর্মের প্রতি একাগ্রতাকেই তুলে ধরেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিশ্বজয়ের অভিপ্রায়ে বের হবার আগে কর্ণ গিয়েছেন স্ত্রী পদ্মাবতীর কাছে। তাঁর জন্মকথা নিয়ে নানা জায়গায় নানা আলোড়নের কথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে। পদ্মাও সেই সমালোচনার আঁচ পেয়েছিলেন তিনি। পদ্মাকে জানিয়েছেন তাঁর প্রকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত — "অধিরথ আমায় কুড়িয়ে পেয়েছেন, রাধা মা আমায় পালন ক'রেছেন।"[৩৪] যদিও তা আগে থেকেই জানতেন পদ্মাবতী। তখন কর্ণ স্ত্রীকে বলেছেন — "তা'হ'লে কি বল্‌ব না আমি অন্যায় ত্যক্তপুত্র, অথবা অন্যের ঔরসজাত সন্তান — আমি জারজযোগে জন্মগ্রহণ ক'রেছি — আমি জারজ এই কথা কি তোমার বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌ল?"[৩৫] কর্ণের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় বাইরের সমালোচনা তাঁকে কতটা বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। তখন তাঁর স্ত্রী পদ্মা তাঁকে ভীষ্ম, দ্রোণ, পঞ্চপাণ্ডব, হনুমান সকলেরই জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত তুলে ধরে তাঁর মনকে শান্ত করতে চেয়েছেন। বলেছেন — "কর্ম্মের গুনে আজ ঐ সকলেই ত শ্রেষ্ঠত্ব আসন অধিকার ক'রেছে — আপনিও তাই — এমন সুবিশাল রূপ দর্শন ক'রে কেনা আপনাকে অভিনব একটী সূর্য্যদেব ধারণা না কর্‌বে, অতএব তজ্জন্য চিন্তা করা উচিত নয়। প্রকাশ একদিন ভগবান্ করবেন !"[৩৬] পদ্মার মুখেও সেই কর্মবাদের প্রসঙ্গাই উপস্থাপিত হয়েছে। স্ত্রীর কথায় তাঁর অশান্ত মন খুঁজে পেয়েছে দিশা। তিনি তাঁর লক্ষ্যকে চরিতার্থ করবার কাজে মনোযোগ দিতে আবার উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন। ভারত-বিজয়ের আগে স্ত্রীর কাছ থেকে চেয়েছেন বিদায়। কৃষ্ণ তাঁকে এই যাত্রায় প্রতিহত করতে চেয়েছেন। রাজা হবার প্রলোভন দেখিয়েছেন তাঁকে। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ কর্ণ। তিনি নিজের উদ্দেশ্য পূরণের পথে কোনো প্রলোভন বা বাধাকে প্রশ্রয় দেন নি। শুধু বিশ্বাস রেখেছেন নিজের বাহুবলের উপর। আরম্ভ হয়েছে কর্ণের দিগ্বিজয় যাত্রা।

পৃথিবী বিজয়ের অভিপ্রায় তাঁর পূর্ণ হবে কিন্তু প্রতিবন্ধক তাতে গুরু প্রদত্ত অভিশাপ। তাই বিশ্বজয়ের সংকল্প গ্রহণ করেই তিনি গুরু ভার্গব তথা পরশুরামে আশ্রমে গিয়েছেন অভিশাপ খণ্ডনের প্রত্যাশায়। প্রথম দর্শনে গুরুদেব তাঁকে পারেন নি চিনতে। তারপর গুরু প্রদত্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে গুরুদেব তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছেন। 'কর্ণ' নাম শুনেও চিনতে না পারায় বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতে বলেন গুরুদেব। তখন তিনি যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর অভিশপ্ত হওয়ার কাহিনি। গুরুর নিদ্রাভঙ্গা যাতে না ঘটে তাই ব্রজ্রকীটের দংশন সহ্য করে নেন শিষ্য কর্ণ। কীট দংশন করতে করতে তাঁর জানুদেশ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। তারপর সেই কীটের মুখ যখন গুরুর মাথায় স্পর্শ করেছে, তখন তাঁর নিদ্রা ভঙ্গা হয়েছে। শিষ্যের সহ্য শক্তি দেখে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাঁর ব্রাহ্মণত্ব সম্পর্কে। তাই যখন তিনি জানতে পেরেছেন যে কর্ণ ব্রাহ্মণ নন, তখনই তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। এ ঘটনার উল্লেখে গুরু পরশুরাম শিষ্য কর্ণকে চিনতে পেরেছেন। সেই সময় গুরুদেব তাঁর মিথ্যা পরিচয় প্রদানের কারণ জিজ্ঞাসা না করলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা তিনি শুধিয়েছেন। আর তাঁর উত্তরে কর্ণ জানিয়েছেন — "ক্ষত্রিয় বিদ্বেষে ভরা তখনও আপনার হৃদয়ের ভাব লক্ষ্য ক'রে ব্রাহ্মণ ব'লেছিলাম, বালকসুলভ চপলতাবশত বলেছিলাম — সেই দোষ কি ধর্‌তে হয় গুরু।"[৩৭] সত্যি একজন পাঠক

© Santiniketan Sahityapath

হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে যেখানে শিক্ষাদানের মাপকাঠি প্রতিভা হওয়া উচিত, সেখানে বংশ পরিচয় নিতান্ত অমূলক। আর একটা অমূলক তথা অনৈতিক কারণে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য গুরু প্রদত্ত কর্ণকে অভিশাপ প্রদান আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অসঙ্গত, নীতি-বিরুদ্ধ বলেই মনে করা হয়। এক্ষেত্রে গুরুর প্রতি কর্ণের এই জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। কর্ণ এসেছেন গুরুকে অনুরোধ করতে তাঁর অভিশাপ প্রত্যাহারের জন্য। কিন্তু গুরুদেব কোনো ভাবেই রাজি হননি। তখন তিনি বলেছেন, "হয় যুদ্ধ ক'রে কর্ণকে ভূতল শায়ী করুণ — নয় কর্ণের অভিশাপ খণ্ডন করুন — ধরুন ধনু ধরুন — আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধপ্রার্থী।"[৩৮] শুরু হয়েছে গুরু শিষ্যের যুদ্ধ। তার মাঝে শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছে। সূর্যদেব পরশুরামকে জানিয়েছেন — "কর্ণ মোর পুত্র।"[৩৯] গুরুদেব কর্ণের প্রকৃত জন্ম পরিচয় জানতে পেরে তাঁকে আশীর্বাদ করেছেন —

"পূর্ণানন্দে দিগ্বিজয়
করহ সমাধা,
ব্যাহত না হবে আর
জিনিবে সমর —
মাত্র মহাযুদ্ধ কালে
অর্জ্জুনের রণে — হবে তুমি
অস্ত্র বিস্মরণ,
এখন পূর্ণানন্দে দিগ্বিজয়
করহ সমাধা।"[৪০]

কর্ণ গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে বের হয়েছেন লক্ষ্য পূরণের সংকল্পে। কিন্তু এই নাটকের পাঠক তথা দর্শক পূর্ব থেকেই কর্ণের অন্তিম পরিণতি জানতে পেরেছেন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি মধ্য দিয়ে — "কর্ণের দিগ্বিজয় সমাধা করা চাই এবং ভার্গব শাপে কর্ণার্জ্জুনের মহাযুদ্ধে কর্ণের অস্ত্র বিস্মরণও চাই।"[৪১] অদৃশ্য নিয়তির লীলাখেলায় এক নিষ্ঠুর পরিণতি অপেক্ষা করেছে কর্ণের জন্য। কিন্তু তিনি বীর, থেমে থাকেন নি তিনি। সর্বপ্রথমে বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে যাত্রা করেছেন 'দ্রুপদের দেশে'[৪২]।

পাঞ্চাল রাজ্য জয়ের অভিপ্রায়ে কর্ণের সম্মুখে প্রথম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন ধৃষ্টদ্যুম্ন। কিন্তু তাঁর পরাক্রমের কাছে, "শ্লথ হ'য়ে পড়ে খসি/ ধনুর্ব্বাণ।"[৪৩] তিনি বন্দি করেছেন তাঁকে। দ্রুপদ পরাভূত। তাঁর রাজ্যে অন্য সকল যোদ্ধাকে আহ্বান জানিয়েছেন কর্ণ। এরপর সম্মুখীন হয়েছেন দ্রৌপদীপ পঞ্চ পুত্রের, যাঁরা তাঁদের পিতা-মাতার বনবাসের সময় মাতুলালয়ে ছিলেন। এখানে আমরা অন্য এক কর্ণকে দেখি। যেখানে অভিমুন্য, ঘটোৎকচের মতো ভ্রাতৃপুত্রকে হত্যা করেছিলেন তিনি, প্রকাশ পেয়েছিলেন তাঁর চরিত্রের নির্মমতা; সেখানে পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচ পুত্রকে হত্যা চান নি তিনি। বরং "বালকগুলিকে ভুলিয়ে বিদায় করতে হলো।"[৪৪] তাঁদের হত্যা কর্ণের বীর যোদ্ধা-সত্তাকে করবে কলঙ্কিত, আবার তাঁদের কাছে বশ্যতা স্বীকার তাঁকে পরিণত করবে ভীরু কাপুরুষে। এইজন্য তিনি চেয়েছেন তাঁদের ক্ষতি না করে নানাভাবে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠাতে। আরো বলেছেন, "তোমরা বেঁচে থাক ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।"[৪৫] এ কর্ণকে অনেক বেশি মানবিক করে গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। অন্যান্য নাটকের থেকে এ নাটকে কর্ণ অনেকখানি আলাদা। 'মহাভারত'এর প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী তিনি ভ্রাতৃপুত্র হত্যায় আশাহত ছিলেন না কোনোদিনই। কিন্তু এই নাটকে সেই ঘটনা সংঘটনে সম্মত নযন তিনি। তাঁকে পঞ্চপুত্র অপমান করেছেন 'ছুতোর মিস্ত্রী'[৪৬] বলে। কিন্তু তিনি নিজের মনেই তাঁদের বৃষকেতুর মতো ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতে চেয়েছেন। নিজেকে "সূত্রধর জাতি নইরে — আমি যে দেবজাতীয় ক্ষত্রিয় — আমি যে তোদের জ্যেষ্ঠ তাত"[৪৭] বলে পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কিন্তু পারেন নি। আর তাঁর এই না পারার জন্য মা কুন্তীকেই দায়ী করেছেন তিনি — "যেমন তুমি ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতার ঔরষে জাত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্রকে ল'য়ে সমাজে বিরাজ কর্‌ছ, হাঁ — মা! তেম্‌নি আমাকে নিয়ে পালন কর্‌লে কি হোত না — দুর্নামের ভাগিনী হ'তে? মা! তাহলে যে কুরুপাণ্ডবের এ বিবাদ ভূমিকার, সৃষ্টিই হ'ত না, মা।"[৪৮] এই সর্বনাশী

যুদ্ধের মূলে ছিল বংশ-কৌলীন্য। কিন্তু কর্ণের সম্মতি না থাকলেও পঞ্চ পাণ্ডবের পুত্ররা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে মনস্থির করেছেন। তাঁদের নিবারণ করতে না পেরে তখন তিনি তাঁদের কাছে হার স্বীকার করে নিয়েছেন। এরপর শুরু হয়েছে সুনিপুন কৌশলে কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ। ঘটনার পরিবর্তনে কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটেছে। কর্ণের শর থেকে রক্ষা করেছেন তাঁদের। সকলের অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি বুঝতে পারেন কর্ণ। তাই পাঞ্চাল রাজাকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন তিনি। ত্যাগ করেছেন পাঞ্চাল রাজ্য। এই নাটকে কর্ণ অনেক বেশি কোমল স্বভাবের। তাঁর মধ্যে বর্তমান ক্ষমা ধর্ম। পরাজয় স্বীকারের সাহস আছে তাঁর মধ্যে। অন্যান্য নাটকে তাঁর যে বিধ্বংসী চেহারা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তা এখানে অনুপস্থিত।

কর্ণ এসেছেন এরপর কৃষ্ণের রাজ্য দ্বারকায়। তিনি জানেন দুর্যোধনের মত পাপীর সংসর্গের জন্য তাঁর সফলতার পথ এত জটিল। তিনি স্পষ্ট করেছেন তাঁর দিগ্বিজয় যাত্রার প্রকৃত উদ্দেশ্য। দুর্যোধনকে মহাযজ্ঞে দীক্ষিত করে ভারতের সার্বভৌম সম্রাট পদে অভিষিক্ত করবার জন্য তাঁর এই পদক্ষেপ। আর তাতে, "যিনি স্নেহপূর্ব্বক শিষ্টাচারের আশ্রয় নিয়ে রাজা দুর্য্যোধনকে কর দান করবেন, তিনি সবান্ধব কর্ণের শরাসনে দগ্ধ না হ'য়ে পরম সম্মানে পৃথিবীতে বিচরণ করবে।"[৪৯] নিজের জন্য নয়, শুধু বন্ধুর জন্যই তিনি সবকিছু জয় করতে চেয়েছেন। তার জন্য অন্যের সঙ্গে শত্রুতা বা অপরের বিরোধিতা করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। সাত্যকির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তায় একথা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে দিগ্বিজয় যাত্রা সফল করার জন্যই তাঁর আগমন ঘটেছে দ্বারকায়। অবশেষে বলরাম কর দিতে রাজিও হয়েছেন। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে জানিয়েছেন, "কর্ণ সূর্য্য-বরে প্রদীপ্ত হ'য়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হ'য়েছে — কুত্রাপি তার এখন পরাজয় হ'বে না — এই জন্যই বলদেবের স্নেহ বৃদ্ধি করিয়েই কর্ণ যুদ্ধ নাট্যের উপসংহার করলেন — এতে যাদবগণের সম্মানেরও হানি হ'ল না — এবং কর্ণও বিজয়ী হ'ল না — অথচ বলদেবের কাছে বিজয়ী হ'য়েই অন্যত্র গমন করবে।"[৫০] বিশ্বজয় করে কর্ণ বন্ধু দুর্যোধনকে যজ্ঞকুণ্ডের সম্মুখে এনে দাঁড় করিয়েছেন। নিজে রাজ পরিচ্ছদ ও মুকুট হাতে তাঁর পাশে সর্বদাই উপস্থিত থেকেছেন। তাঁকে মুকুট পরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেছেন, "আজ থেকে ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হ'লেন দুর্য্যোধন, সকলে ভারতেশ্বরের জয় ঘোষণা কর।"[৫১] একা একজন মহারথি এক বসনে একটি রথে বিশ্বজয় করে এনে দুর্যোধনকে উপহার দিয়েছেন সেই রাজ-সিংহাসন যা দুর্যোধনকে পৃথিবীর অধীশ্বরে পরিণত করবে। দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির দুজনই এই যজ্ঞ করেছেন, সভার মাঝে শকুনি উপস্থাপন করেছেন এই প্রশ্ন — কার যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ? এর উত্তরে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের পক্ষ নিয়েছেন। কর্ণ তখন বলেছেন, "ওটা ভীষ্মদেবের চিরপোষিত নিভৃত হৃদয় রাজ্যের গুপ্তসংবাদ — ওঁর ভালোবাসা ঐ রূপই প্রকাশ করে — ঐ রূপ বলে।"[৫২] কিন্তু পরবর্তীতে বিদুরও যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বললে সভাস্থলে বিদুরকে অপমান করেন কর্ণ। কর্ণের আত্ম-অহংকার প্রকাশক কথা শুনে ভীষ্ম তাঁকে চিত্রসেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের কথা মনে করিয়ে দেন। রামায়ণের রাবণ অঙ্গদের কথোপকথনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে উত্তর প্রদান করেছিলেন, "হে দশানন! যদি আমাকে বালী পুত্র বলে চিন্‌তে পারছ না, বালীই বা কে তাও যদি স্মরণ আস্‌ছে না, তবে তোমার গলাদেশটায় একবার হাত বুলিয়েই দেখনা — তা'হলে চিন্‌তে পারবে বালীকে। তেম্‌নি চিত্রসেন যুদ্ধটা ভেবে দেখ্‌লেই ভালো হয় না? তাই বলছি মূর্খের ধারাপাত ছিন্ন হয় এবং জিজ্ঞাসার কাছে নয়ন জলধারাপাতই সার হয়।"[৫৩] অপমানিত কর্ণ তখন সংকল্প গ্রহণ করেন, "যতদিন না পঞ্চ পাণ্ডবকে বধ করছে — ততদিন অতৈল শরীরে হবিষ্যাসী হ'য়ে একমাত্র বস্ত্র পরিধান ক'রে, উষ্ণীশ, ছত্র, পাদুকা বর্জ্জন ক'রে রাক্ষসী ব্রত অবলম্বন ক'রে দাঁড়াল।"[৫৪] পঞ্চপাণ্ডব বধে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি।

এই নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন ছদ্মবেশী ইন্দ্রদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কর্ণকে করা ছলনার কথা। একদিন কর্ণের দানমঞ্চে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র দান প্রার্থনার পূর্বে তিনি তাঁকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানতেন এই প্রার্থীর কথা। তাঁর স্বপ্নে এসে নিষেধ করেছিলেন দেবাদিদেব বৈকর্তন। ব্রাহ্মণ চেয়েছিলেন তাঁর সহজাত কবচ-কুণ্ডল। সূর্যদেবের নিষেধ, স্ত্রীর বারণ সবকিছুকেই উপেক্ষা করে তিনি ছদ্মবেশী ইন্দ্রদেবকে দান করেছেন তাঁর প্রার্থিত বস্তু। ইন্দ্রদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করতে বললে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বারবার ইন্দ্রদেব অনুরোধ করলে তিনি বলেছেন, "একান্তই যদি বর দিতে আপনার সাধ হয়, তবে

© Santiniketan Sahityapath

আপনার বজ্রতুল্য যে একটি একাঘ্নী নামক মহাস্ত্র আছে সেইখানি আমায় প্রদান করুন।"[৫৫] অন্যান্য নাটকে কর্ণ যেন নিজের দাবি বশত প্রার্থনা করেছিলেন, এখানে তেমন নয়। ববং এ কর্ণ যেন ভাগ্যের কাছে হার মেনে নিয়েছেন। তাঁর বলা কথায় যেন অসহায়ত্বেরই সুর — "দেবরাজ! আমার যখন কবচকুণ্ডল গেল, তখন আর আমার থাক্‌ল কি? প্রভো! আমি গুরু ভার্গবের শাপে প্রায় অর্দ্ধমৃত ছিলাম, আজ এই কবচকুণ্ডলও গেল — আমি যে এখন সম্পূর্ণ মৃত, আমি বর নিয়ে আর কি কর্‌ব? যেমন কৃষ্ণাদেশে পাণ্ডব সকাশ হ'তে কর্ণের কাছে এসেছিলেন — তেম্‌নি আবার কর্ণাদেশে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বল্‌বেন, আর কেন ধরাধামে তাকে দগ্ধ কর্‌তে রেখেছেন, শীঘ্র আপনার অর্জ্জুনকে ল'য়ে তাঁকে বধ করুন।"[৫৬] সারাজীবন ধরে সংগৃহীত অভিশাপ, ছদ্মবেশীদের ছলনা, নিষ্ঠুর পাপী দুর্যোধনের সংসর্গ তাঁর মৃত্যুকে নিশ্চিত করে তুলেছে। তবু তিনি শেষ পর্যন্ত দান করে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের বেশে এসে নরমাংস ভোজনের অভিলাষ করেছেন। জানিয়েছেন কর্ণপুত্র বৃষকেতুকে বলি দেবার কথা। অনেক কাতর অনুনয়-বিনয়ের পরও ব্রাহ্মণ যখন তাঁর নিজ সংকল্পে অটল, তখন তিনি তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করতে পুত্রকে বলি দিয়েছেন। তাঁর এই সমর্পণ প্রত্যক্ষ করে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়ে দিয়েছেন বৃষকেতুকে। জয় হয়েছে সত্যরক্ষক, দানবীর কর্ণের। নাট্যকার রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ এই নাটকটি রচনার ক্ষেত্রে যে বিষয় নির্বাচন করেছেন, সেটা কর্ণের প্রচলিত জীবনকথা থেকে অনেকটাই পৃথক। এখান থেকে জানা গেছে কর্ণের জীবনে অনেক অজানা তথ্য।

নাটকটি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের মনে হয়েছে নাট্যকার রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদের হৃদয়ের এক কোমল আসলে কর্ণের অধিষ্ঠান। অন্যান্য নাট্যকার অপেক্ষা তিনি কর্ণকে নির্মাণ করেছেন অনেকখানি কলঙ্ক-মুক্ত করে। দুরাচারী দুর্যোধনের প্রতি তাঁর আনুগত্য তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি তাঁর হৃদয়ে প্রবাহিত স্নেহ-মমতার প্রস্রবণকে তিনি সমান গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন তাঁর নাটকে। পৌরাণিক নাটকের যে আবহাওয়া দর্শকদের ভক্তিরসে মাতিয়ে তুলেছিল, সেই স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে কর্ণ হয়ে উঠেছেন কখনো প্রকৃত বন্ধু, আবার কখনো বা মায়ের পরিত্যক্ত অভাগা সন্তান, পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ভাই।

তথ্যসূত্র:

১। 'পুষ্কল মোচন', রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, ভূমিকা, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, জোড়াসাঁকো, ১৩৩০

২। 'পাঞ্চালী', রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, ভূমিকা, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৩০

৩। 'সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ', রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, ভূমিকা, পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, জোড়াসাঁকো, ১৩৩৩

৪। 'মহামায়া বা ঘোরাসুর-বধ গীতাভিনয়', রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, ভূমিকা, তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৩৩

৫। 'ভার্গব-বিজয়', রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, ভূমিকা, তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৩৮

৬। ওই, ভূমিকা

৭। 'কর্ণ-দিগ্বিজয়', রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, বিজ্ঞাপনাংশ, তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৩৬

৮। ওই, বিজ্ঞাপনাংশ

৯। ওই, পৃ. ৫

১০। ওই, পৃ. ৮

১১। ওই, পৃ. ৮

১২। ওই, পৃ. ১১

১৩। ওই, পৃ. ১৪

১৪। ওই, পৃ. ১৪

১৫। ওই, পৃ. ১৫

১৬। ওই, পৃ. ৪৫

১৭। ওই, পৃ. ৫০

১৮। ওই, পৃ. ৫৬

© Santiniketan Sahityapath

১৯ । ওই, পৃ. ৮৫
২০ । ওই, পৃ. ৯১
২১ । ওই, পৃ. ১০২
২২ । ওই, পৃ. ১০২
২৩ । ওই, পৃ. ১০৩
২৪ । ওই, পৃ. ১০৩
২৫ । ওই, পৃ. ১১২
২৬ । ওই, পৃ. ১৩৩
২৭ । ওই, পৃ. ১৩৩
২৮ । ওই, পৃ. ১৫০
২৯ । ওই, পৃ. ১৪০
৩০ । ওই, পৃ. ১৪৩
৩১ । ওই, পৃ. ১৪৩
৩২ । ওই, পৃ. ১৪৩
৩৩ । ওই, পৃ. ১৪২
৩৪ । ওই, পৃ. ১৪৬
৩৫ । ওই, পৃ. ১৪৬
৩৬ । ওই, পৃ. ১৪৮
৩৭ । ওই, পৃ. ১৫৬
৩৮ । ওই, পৃ. ১৫৭
৩৯ । ওই, পৃ. ১৫৯
৪০ । ওই, পৃ. ১৬০
৪১ । ওই, পৃ. ১৬০-১৬১
৪২ । ওই, পৃ. ১৬১
৪৩ । ওই, পৃ. ১৬৬
৪৪ । ওই, পৃ. ১৬৮
৪৫ । ওই, পৃ. ১৬৮
৪৬ । ওই, পৃ. ১৬৮
৪৭ । ওই, পৃ. ১৬৮
৪৮ । ওই, পৃ. ১৬৮-১৬৯
৪৯ । ওই, পৃ. ১৭৬
৫০ । ওই, পৃ. ১৭৮
৫১ । ওই, পৃ. ১৮১
৫২ । ওই, পৃ. ১৮৫
৫৩ । ওই, পৃ. ১৮৬
৫৪ । ওই, পৃ. ১৮৭
৫৫ । ওই, পৃ. ২৫০
৫৬ । ওই, পৃ. ২৫০

© Santiniketan Sahityapath

গ্রন্থপঞ্জি:

- অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ৫ম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৪২৩
- আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২য় সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৬৮
- নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, 'মহাভারত নীতি অনীতি দুর্নীতি', পত্রলেখা, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৪
- নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, 'মহাভারতের প্রতিনায়ক মহাভারতের প্রতিপক্ষ নায়ক এবং এক উদাসীন', আনন্দ, কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, জুন, ২০১৪
- পুলিন দাস, 'বঙ্গ রঙ্গামঞ্চ ও বাংলা নাটক ১ম খণ্ড', (১৭৯৫-১৯২০), এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪২৫
- পুলিন দাস, 'বঙ্গ রঙ্গামঞ্চ ও বাংলা নাটক ২য় খণ্ড', (১৯২১-১৯৭২), এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৭
- রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, 'পাঞ্চালী', পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩৩০
- রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, 'পুষ্কল-মোচন', পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, জোড়াসাঁকো, ১৩৩০
- রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, 'মহামায়া বা ঘোরাসুর-বধ গীতাভিনয়', তারা লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৩৩
- রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, 'সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ', পাল ব্রাদার্স এন্ড কোং, জোড়াসাঁকো, ১৩৩৩
- রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, 'ভুবনেশ্বরী, তারা লাইব্রেরি', কলকাতা, ১৩৩৮
- রামদুর্ল্লভ কাব্যবিশারদ, 'কর্ণ-দিগ্বিজয়', তারা লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৩৬

—

Prantik Gabeshana Patrika